অ্যামচ্যামের সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে শেখ হাসিনা প্রদত্ত ভাষণের পূর্ণ বিবরণ

সম্মানিত সুধীবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, বন্ধুপ্রতিম ও উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহের মাননীয় রাষ্ট্রদূতবৃন্দ,

সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমেরিকান চেম্বারের আজকের এই মধ্যাহ্ন ভোজে আমাকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ করায় আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাঙালি জাতির বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমরা অর্জন করেছিলাম স্বাধীনতা।

আজকের এই দিনে আমি স্মরণ করতে চাই আমাদের মুক্তিসংগ্রামের সকল শহীদদের যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ বিশ্বমানচিত্রে স্থান পেয়েছে।

আমাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। মানুষের মৌলিক চাহিদা - অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধান করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন, “এদেশের মানুষকে উন্নত জীবনের অধিকারী করাই আমার সারাজীবনের স্বপ্ন”। জাতির জনকের স্বপ্ন সফল করে জনগণকে উন্নত জীবন উপহার দেয়াই আমাদের রাজনীতির উদ্দেশ্য।

আপনারা জানেন, বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের সবচাইতে বড়ো শত্রু দারিদ্র। দারিদ্রের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়।

অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও বিশ্বায়নের এই যুগ সমগ্র পৃথিবী একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। বিশ্বঅর্থনীতির আওতায় প্রতিটি দেশের অর্থনীতি কোন না কোনভাবে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত, পরিপূরক অথবা নির্ভরশীল।

সেকারনেই শক্তিশালী জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে অভ্যন্তরীন অর্থনীতির প্রতি নজর রাখার পাশাপাশি ভাবতে হবে সামগ্রিক বিশ্বঅর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে। উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার প্রয়োজনে খুঁজতে হবে বিশ্ববাজার। বিদেশী বিনিয়োগের অনূকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে ।

রপ্তানিযোগ্য নতুন নতুন পণ্যের চাহিদা খুঁজে বের করতে হবে। একবিংশ শতাব্দীর চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশ্বায়নের এই যুগে কোন দেশের পক্ষেই রক্ষণশীল অর্থনীতি ও ‘একলা চলো নীতি’ নিয়ে পথচলা সম্ভব নয়। সবার সামগ্রিক প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও প্রণোদনার মাধ্যমেই প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে।

আমাদের সামনে যেমন দারিদ্রের মতো চ্যালেঞ্জ রয়েছে তেমনিভাবে দক্ষিণ এশিয়ার রয়েছে একটি সম্ভাবনাময় বিশাল বাজার। আমার বিশ্বাস, এই বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠির সামর্থ্যের উন্নতি ঘটিয়ে, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারলেই এই বিশাল বাজার বিশ্বঅর্থনীতির জন্য সুফল বয়ে আনবে।

এজন্য শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে। শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য ও প্রযুক্তির সহায়তাই নয়, নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা দিতে হবে, সরাসরি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

এধারণা থেকেই ২০০১ সালের জুলাই মাসে ইটালিতে অনুষ্ঠিত গ্রুপ-৮ এর সামিটে এশিয়ার প্রতিনিধিত্ব করার সময় আমি দারিদ্র বিমোচনকে এজেন্ডা হিসাবে গ্রহন করার প্রস্তাব উথাপণ করি। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, সেই সামিটেই প্রথম জি-৮ দারিদ্রবিমোচনকে এজেন্ডা হিসাবে গ্রহন করে।

আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে ১৯৯৮ সালের ১৫ জানুয়ারি ঢাকায় তিনদেশের প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের ত্রি-দেশীয় বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন করি।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভূটান ও নেপালের সমন্বয়ে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিমসটেক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আপনারা জানেন, ১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি। এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলাম যেখানে ছিল উদারতা, সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সুশাসন।

বাংলাদেশ অফুরন্ত সম্ভাবনার দেশ হিসাবে বহির্বিশ্বে পরিচিত হয়েছিলো ।

বিনয়ের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও নিরলস পরিশ্রমে দেশে সূচিত হয়েছিল অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক নিরাপত্তার ধারা এবং ইতিবাচক রাজনীতি।

খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশকে আমরা উদ্বৃত্ত খাদ্যের ভান্ডারে পরিণত করেছিলাম। খাদ্য উৎপাদন ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন বেড়ে ১ কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২ কোটি ৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়।

সাক্ষরতার হার ৪৫% থেকে ৬৬% ভাগে উন্নীত করেছি।

ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

মাথাপিছু আয় ২৪৫ মার্কিন ডলার হতে ৩৯০ মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি করেছি।

প্রবৃদ্ধি ৬.৬ ভাগে উন্নীত করেছি, মুদ্রাস্ফীতি ১.৫৯ ভাগে নিয়ন্ত্রিত করেছি।

গড় আয়ু ৫৮.৭ থেকে বেড়ে ৬৩ বছরে উন্নীত হয়।

জন্মহার ও মৃত্যুহার হ্রাস পায় ৬.৬ ভাগ ও ৩ ভাগ।

শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৭১ থেকে কমে ৫৮ তে নেমে আসে।

১.৫% হারে দারিদ্র হ্রাস পাচ্ছিলো। এই গতি কমে বর্তমানে .৫% এ নেমে এসেছে।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং বিশ্ব ফোরামে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে আমরা দেশকে এমন একটি অবস্থানে উপনীত করেছিলাম যে আমাদের সমালোচকরাও স্বীকার করেছিলেন যে, বাংলাদেশ সক্ষম হয়েছে তার অতীতের নেতিবাচক ভাবমূর্তি মুছে ফেলতে।

১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠনের সময় এদেশে আমেরিকান বিনিয়োগ ছিলো ২৫ মিলিয়ন ডলার। আওয়ামী লীগ আমলে তা ১.২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিলো।

বেসরকারীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আইন পাশ করি। তারই সুফল হিসাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ থেকে ৪৩০০ মেগাওয়াটে বৃদ্ধি করেছিলাম।

বেসরকারিখাতে বিমান পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়।

টেলিফোন ও মোবাইল ফোনখাতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হয়। মোবাইল ফোন ব্যবসা মনোপলির পরিবর্তে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

সেকারনেই ১৯৯৬ সালে যেখানে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ছিলো দুই হাজার তা এখন প্রায় দুই কোটি।

আমাদের সরকার তথ্যপ্রযুক্তি ও কৃষিনির্ভর শিল্পখাতকে থ্রাষ্টসেক্টর হিসাবে ঘোষণা করে। কম্পিউটার ও এর খুচরো যন্ত্রাংশ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম আমদানিকে শুল্কমুক্ত করা হয়।

যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে আমরা ২ লক্ষ মিটার ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণ করেছি। ৭০ হাজার কিলোমিটার পাকা ও কাঁচা সড়ক নির্মাণ করেছি।

পার্বত্য চট্রগ্রামে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে আমরা দুই দশকের রক্তক্ষয়ী জাতিগত সংঘাত বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলাম ।

ভারতের সাথে ত্রিশ বছর মেয়াদী গঙ্গার পানি চুক্তি করি।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে আমাদের সেনা বাহিনীর অধিকতর অংশগ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করেছিলাম।

আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে।

দারিদ্র বিমোচনকে মূল কর্মসূচি হিসাবে গ্রহণ করে আমরা বয়স্কভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, মুক্তিযোদ্ধাভাতা এবং শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করেছিলাম। সৃষ্টি করেছিলাম সামাজিক নিরাপত্তা।

আশ্রয়নপ্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ হাজার দরিদ্র আশ্রয়হীন পরিবারকে বিনামূল্যে ঘর প্রদান করার পাশাপাশি ৫% সার্ভিস চার্জে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে পুনর্বাসন করি।

দরিদ্র নারীদের জন্য সুদবিহীন ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচী গ্রহন করি। গৃহহীন মানুষদের ঘর তৈরির জন্য ১% সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে বিভিন্ন এনজিওদের গৃহায়ন তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করি।

একটি বাড়ি একটি খামার, কমিউনিটি হেল্থ ক্লিনিক, কর্মসংস্থান ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণদান প্রকল্প দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। একটি সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ড পরবর্তী সরকার এগিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সাথে দেখলাম, ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতা গ্রহনের পর আমাদের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো বন্ধ করে দেয়। পরিবর্তন করে অনেক প্রকল্পের নাম।

সচল হয় দুর্নীতির চাকা, ব্যাপকতর হয় সন্ত্রাস ও দলীয়করণ। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে বিতর্কিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশ পরিচিত হয় গ্রেনেড হামলা করে ২৪ জন মানুষ হত্যার দেশ, বিদেশী রাষ্ট্রদূতের উপর গ্রেনেড হামলার দেশ, একই সময়ে ৫০০ স্থানে বোমা হামলার দেশ, সাংবাদিক নির্যাতনের দেশ, মানবাধিকার লংঘনের দেশ, নারী নির্যাতনের দেশ হিসাবে। কতিপয় ব্যক্তি ও পরিবারের দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশ বারবার দুর্নীতিতে শীর্ষস্থান নিয়েছে।

এপ্রসঙ্গে আমি আমাদের ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাতে চাই। সহায়ক পরিবেশ না থাকার পরেও, তারা নিজেদের মেধা, পরিশ্রম ও যোগ্যতা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন, শিল্পপ্রসারে ভূমিকা রেখেছেন, বিদেশী বিনিয়োগ আনার জন্য কাজ করেছেন।

আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই প্রবাসীদের, যাদের কষ্টার্জিত উপার্জন দেশে পাঠানোর কারনে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ টিকে আছে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে দেখা যায়, সরকারের জবাবদিহিতা, কার্যকরিতা, রেগুলেটরী যোগ্যতা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মতো সুশাসন সূচকের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের তুলনায় পরবর্তী সরকারের পারফর্মেন্স অনেক দুর্বল। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থতা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রবৃদ্ধি অবশ্যই ডাবল ডিজিট অতিক্রম করতে হবে। এটা সম্ভব মূলত সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে।

আমরা দেশকে শাসনহীনতা, দুর্নীতি ও দলীয়করণ থেকে মুক্তি দিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই।

আমরা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। নির্বাচনকে সরকার পরিবর্তনের একমাত্র পথ বলে মনে করি।

২০০১ সালে আমাদের সরকার দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম শন্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। আমাদের আশা ছিলো, সেই দৃষ্টান্ত ২০০৬ সালেও অনুসরণ করা হবে।

কিন্তু তা হয়নি। বিএনপি-জামাত জোট ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার যে ষড়যন্ত্র করেছে তার কারণেই তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় দেশে অস্থির পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আমাদের বাধ্য করা হয় আন্দোলনে যেতে। ৭৭ জন মানুষ জনগণের ভোটের অধিকার রক্ষায় জীবন দেয়।

এই জটিল পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরাও।

মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ জীবন দিয়েছে, আপনাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠার পদক্ষেপ নেবো।

এমন একটি সরকার গড়তে চাই যারা বাংলাদেশকে পুনরায় সুশাসনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারলে আমরা দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ফিরিয়ে আনবো। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে “মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ” প্রতিষ্ঠা করবো। বাজার তদারকির ব্যবস্থা করা হবে।

এক বছরের মধ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি সহনশীল পর্যায়ে নিয়ে আসবো। সরকারি-বেসরকারি এবং দেশী-বিদেশী যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সোলার এনার্জি প্রজেক্ট ও উইন্ড এনার্জি প্রজেক্ট, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করবো।

জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বন্ধ করবো। সন্ত্রাসী ও তাদের গডফাদারকে চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার ও বিচার করা হবে। সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করা হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা ও কার্যকরিতা নিশ্চিত করা হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সব স্তরের দুর্নীতি উচ্ছেদ করবো। দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হবে। অর্থ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।

দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার ব্যবস্থা নেবো। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে চারস্তর বিশিষ্ট শক্তিশালী স্থানীয় সরকার কাঠামো কার্যকর করা হবে। এক বছরের মধ্যে জেলা ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা হবে। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

সকল সরকারী অফিসকে ই-গভর্নেন্সের আওতায় আনবো।

বিচার বহির্ভুত হত্যা বন্ধ করা হবে। মৌলিক অধিকার পরিপন্থী সকল আইন ও বিধি বাতিল করা হবে। প্রশাসন ও বিচার বিভাগের দলীয়করণ বন্ধ করবো। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচারের রায় বাস্তবায়ন করবো। জেলখানায় জাতীয় চারনেতা হত্যার বিচারকাজ সমাপ্ত করা হবে। সকল রাজনৈতিক হত্যাকান্ডের তদন্ত ও বিচার করা হবে। ইতিহাস বিকৃতি রোধ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস প্রতিষ্ঠা করা হবে।

বন্ধ কল কারখানা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে। পাট, চিনি, টেক্সটাইল ও গার্মেন্টস শিল্প রক্ষা ও বিকাশের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বিভিন্ন শিল্পের জন্য অঞ্চলভিত্তিক শিল্পপার্ক গড়ে তোলা হবে।

দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। সকল আন্তর্জাতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তির বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে।

ঢাকায় এলিভেটেড রাস্তা, পূর্ব-পশ্চিমমুখী রাস্তা ও রিং-রোড নির্মাণ করে যানজট নিয়ন্ত্রণ করবো।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের রেলযোগাযোগ খাতের উন্নতি করা হবে।

প্রত্যেক পরিবারের অন্তত একজন কর্মক্ষম যুবকের কর্মসংস্থানের জন্য "এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম" চালু করা হবে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম ও পরিধি বাড়ানো হবে।

কৃষি উপকরণের দাম কমানো হবে। কৃষিনির্ভর শিল্প স্থাপন করা হবে।

ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার জট থেকে মানুষকে মুক্ত করতে ভূমি ব্যবহার ও ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য কম্পিউটারাইজড করা হবে।

১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতি পুণর্বহাল করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবো। সংসদের সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনসহ সকল প্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো হবে।

শিক্ষাকে বিশ্বমান সম্পন্ন করা হবে। ছেলে-মেয়ে সবার জন্য স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে।

সাবমেরিন ক্যাবল ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করে সারাদেশে সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করা হবে। ট্যারিফ হ্রাস করা হবে।

আমাদের তরুণ প্রজন্ম সুযোগ পেলে যে কোন দেশের সাথে শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারে। তাদের জন্য পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা রাখবো।

সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবো। গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রবর্তিত ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক আবার চালু করা হবে।

আমরা সরকারে থাকতে রেডিও-টেলিভিশনকে স্বায়ত্তশাসন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তা কার্যকর করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করা হবে। আদিবাসীসহ পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির উন্নয়নে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও কারও সঙ্গে বৈরিতা নয়' এই নীতির আলোকে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা হবে। পড়শী দেশগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখবো। দক্ষিণ এশিয়ার দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করা হবে।

গ্যাস, কয়লাসহ খনিজ সম্পদের জাতীয় স্বার্থে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। স্বচ্ছ জাতীয় নীতির অধীনে এই খাতে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

বন্দর ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, দক্ষ ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হবে। চট্টগ্রাম বন্দর ও মংলা বন্দরকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান বন্দরে উন্নত করা হবে।

গভীর সমুদ্র বন্দর, নতুন বিমানবন্দর, এশিয়ান হাইওয়ে ও রেলওয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতু হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। এক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী ও দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দল-মত নির্বিশেষে এদেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ লড়াই করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলো।

আগামী ২০২০ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করবে।

সুর্বণজয়ন্তীর সেই বছরকে মাইলস্টোন হিসাবে ধরে আমরা 'ভিশন ২০২০' নিয়ে পথ চলতে চাই। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে চাই একটি দারিদ্রমুক্ত দেশ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কল্যানমুখী সমাজ।

দীর্ঘক্ষন ধৈর্য্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।